মুসলিম রাজনৈতিক নেতাদের ধর্মীয় ভন্ডামী

আবদুর রাউফ

যে কোনও দেশের রাজনীতিতে এমন অনেকই থাকেন যাঁরা কোনও ধর্ম মানেন না। আমাদের দেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বিশেষ করে আমাদের এই রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস অবিশ্বাসের খোঁজ যাঁরা রাখেন, তাঁদের এই ব্যাপারটা বিলক্ষণ জানা আছে। মার্কসবাদীরাতো আদর্শগত কারণে ঘোষিতভাবেই ধর্মহীন মানুষ। আমাদের এই সেকুলার গণতান্ত্রিক দেশে ধর্ম মানা অথবা না মানা সবই ব্যক্তির নিজস্ব অভিরুচির ব্যাপার। এনিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলার অর্থই হল ব্যক্তির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা। আমাদের সেকুলার সংবিধানে যে কোনও পূর্ণবয়স্ক নাগরিককে ধর্ম মানা কিংবা না মানার মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে। তাই কোনও রাজনৈতিক নেতা ধর্ম না মানলে সেটা কোনও সমালোচনার বিষয় হতে পারে না। কিন্তু যিনি ধর্ম মানেন না, যদি দেখা যায় ক্ষেত্র বিশেষে তিনি ধর্ম মানার ভান করছেন তাহলে সেই ভণ্ডামির সমালোচনা হতেই পারে এবং হয়ও। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, সমালোচনা যতই হোক, বিশেষে করে রাজনীতিকদের মধ্যে এই ভণ্ডামি বর্জনের কোনও সদিচ্ছা নজরে পড়ে না।

সেটার কারণও অবশ্য বুঝতে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আমাদের এই গণতান্ত্রিক দেশে যেখানে মাথাগুণতি ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা বিভিন্ন স্তরের ক্ষমতার প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়, সেখানে আমজনতার আস্থাভাজন হয়ে উঠতে পারাটা একটা জরুরি বিষয়। নেতারা জানেন এই আমজনতার অধিকাংশই কোনও না কোনও ধর্মে আস্থাশীল। এধরনের ধর্মপরায়ণ ভোটদাতাদের কাছে নেতার ভাবমূর্তি যদি এমন হয় যে তিনি কোনও ধর্মই মানেন না তাহলে তিনি আর তাদের আস্থাভাজন থাকবেন কিনা তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট নেতার মনে সংশয় থাকাটাই স্বাভাবিক। এই সংশয়ের কারণেই ভণ্ডামিকে প্রশ্রয় দেওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যাদের মন ভোলানোর জন্য এই ভণ্ডামি তারা কি সত্যিই ব্যাপারটা বুঝতে পারে না? প্রশ্নটি সম্পর্কে সচেতন মানুষেরা তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে জানেন জনসাধারণের মধ্যে নেতারা ভণ্ডামি ধরতে না-পারাদের সংখ্যাই সাধারণত বেশি হয়। অর্থাৎ তাঁরা নেতার লোকদেখানো ধর্মাচরণগুলির ফাঁকি সবসময় ধরতে পারেন না। যাঁরা ধরতে পারেন তাঁদের পক্ষে বাকি বিপুল জনতার বিভ্রান্তি কাটিয়ে দেয়ার সুযোগ তেমন থাকে না। ফলে ভণ্ডামিকে প্রশ্রয় দিয়ে ধর্মে আস্থাহীন নেতারা ধর্মভীরু জনসাধারণের ভোট দিব্যি বাগিয়ে নিতে পারেন। অর্থাৎ সাময়িকভাবে হলেও তাঁদের অজ্ঞতার সুযোগ নিতে পারেন।

আমাদের দেশে বিশেষ করে মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে এধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি প্রায়শই লক্ষ করা যায়। যেসব মুসলিম নেতা মুসলিমপ্রধান এলাকায় মুলত মুসলমানদের ভোটে নির্বাচিত হয়ে বিভিন্ন স্তরে জনপ্রতিনিধিত্বের আসন দখল করেন তাঁদের একটা বড়ো অংশই ইসলাম ধর্মের অবশ্যপালনীয় কর্তব্যগুলি সম্পর্কে উদাসীন। মুসলিম জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে কেউ কেউতো সেগুলি আদৌ পালন করার প্রয়োজন আছে বলেই মনে করেন না। বলাই বাহুল্য, তাঁদের একটা বড়ো অংশই মার্কসবাদী। মার্কসবাদীরা যে ধর্ম মানে না—এ তো জানা কথাই। কিন্তু এই 'না মানাটা' যাতে ধর্ম মেনে চলা মুসলিম জনসাধারণের নজরে তেমনভাবে না পড়ে সেসম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মার্কসবাদী নেতা বেশ সতর্ক থাকেন। কিন্তু যে নেতা মুসলিম সমাজে বসবাস করেন তাঁর পক্ষে এই সতর্ক থাকাটা বেশ কঠিন কাজ।

কারণ, ইসলামে ধর্মাচরণগুলি যত না ব্যক্তিগত, তার চেয়ে অনেক বেশি সমষ্টিগত। নামাজ একা একা পড়ার চেয়ে সবাই মিলে জামাত করে পড়া উত্তম। প্রতি শুক্রবার জুম্মার নামাজ অবশ্যই মসজিদে গিয়ে সমষ্টিগতভাবে জামাত করেই পড়তে হয়। এর জন্য অন্য কোনও বিকল্প বিধান নেই। কোনও বিশেষ কারণ (অস্বাভাবিক পরিস্থিতি, অসুস্থতা কিংবা স্থানান্তরে গমন) ছাড়া জুম্মার জামাতে অনুপস্থিতির একটাই অর্থ দাঁড়ায় ইসলামি ধর্মাচরণে আস্থার অভাব। যাঁর সত্যিই আস্থার অভাব আছে তিনি যদি তাঁর প্রকৃত মনোভাব মুসলিম-জনসাধারণের সামনে লুকোতে চান তাহলে কাজটা কতখানি কঠিন হয় তা সহজেই অনুমেয়। সত্যি কথা বলতে কি, ইসলামে আস্থার অভাব যদি নাও বলি, নিষ্ঠার অভাবের ব্যাপারটা মুসলিম সমাজে লুকানো যায় না। তাই যেসব রাজনীতিক ধর্মহীন, বিশেষ করে মার্কসবাদীরা অন্তত বাঙালি মুসলিম সমাজে ধর্মের ব্যাপারে নিজেদের অবস্থানটা লুকোবার তেমন কোনও চেষ্টা করেন না। যদিও যেসব জমায়েতে নামাজি কিংবা রোজাদার মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য থাকে সেখানে তাঁরা বেশ অস্বস্তিতে থাকেন। কোথাও কোথাও পরিস্থিতি এমনই হয়ে ওঠে যে, রোজা না রেখেও উপবাসী থাকার ভান করতে হয়। সবাই নামাজ পড়ার জন্য অজু করে একত্রিত হচ্ছে দেখে হয় সুযোগ বুঝে কেটে পড়তে হয়, নয়তো অন্যন্যোপায় হয়ে জামাতে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার অভিনয় করতে হয়।

উর্দুভাষী মুসলিম সমাজে অবশ্য ভান করে কিংবা অভিনয় করে পার পাওয়া অপেক্ষাকৃত কঠিন। কারণ এই সমাজে সবাই প্রকৃত ধার্মিক কিনা সে প্রশ্নে সংশয় থাকলেও ধর্মীয় আচার-আচরণে নিষ্ঠাবানদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি। তাই উর্দুভাষী ধর্মহীন রাজনীতিকেরা আপন সমাজে মেলামেশার সময় নানারকম সূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বন করে থাকেন। যেখানে নামাজের জন্য জমায়েত শুরু হয়ে গেছে পারতপক্ষে সেখানে যান না। কিংবা গিয়ে পড়লেও যথাসময়ে নানারকম অজুহাত দেখিয়ে সেখান থেকে কেটে পড়েন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে কেটে পড়লে জনসাধারণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় বাধ্য হয়েই জামাতে নামাজ পড়ার অভিনয় করতে হয়। ব্যাপারটা ঈদ কিংবা বকরীদে কলকাতার রেডরোডের জামাতে নামাজ পড়ার সময় অনেকেরই নজরে পড়ে থাকতে পারে। জনসংযোগের তাগিদে কোনও কোনও খ্যাতিমান মার্কসবাদী মুসলিম নেতাকে নামাজের জামাতে দেখা যায়। কোনও ফরজ নামাজ না পড়লেও এই ওয়াজেব নামাজের জামাতে তাঁরা দাঁড়িয়ে যান রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির মতলবে। নামে মুসলমান বলেই কেবল হাজিরা দিয়ে হিন্দু নেতাদের মতো জনসংযোগের দায় সারা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না। কারণ, তাঁরা জানেন, নামে মুসলমান, জামাতের সময় হাজির আছে অথচ নামাজ পড়ছে না—এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে হবেই। তাই বিশ্বাস না থাকলেও ওঠ বোস করে নিতে তাঁরা বাধ্য হন। অবশ্য দলের দেয়া জনসংযোগের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে দলীয় নেতৃত্বের অনুমতিসাপেক্ষেই তাঁরা এধরনের বড়ো জামাতে হাজির থাকেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির তাগিদ না থাকলে পারতপক্ষে তাঁরা নামাজ পড়া জমায়েতের ধারকাছ দিয়েও হাঁটেন না। কিন্তু এই তাগিদের কারণেই রোজার মাসে এফতার পার্টির দাওয়াত রক্ষা না করে উপায় থাকে না। এই দাওয়াত রাখতে গেলে মাগরিবের নামাজ এড়ানো মুশকিল। তাই কোনও কোনও মার্কসবাদী মুসলিম নেতাকে দেখা যায় নামাজের আগেই অন্য দাওয়াতের অজুহাত দেখিয়ে কেটে পড়ছেন। [illegible] এমনও আছেন, লোক পাঠিয়ে মাগরিবের নামাজ পড়া হয়ে

গেছে কিনা খবর নিয়ে তারপর এফতার পার্টিতে আসেন।

এমন কিছু কিছু মার্কসবাদী রাজনীতিক অবশ্য আছেন, যাঁরা বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলাচলের মধ্যে থাকেন। বিশেষ করে ঈদের নামাজের সময় গোটা মহল্লা কিংবা গ্রাম যখন ঈদগাহমুখী হয় উৎসবমুখর সেই জনজোয়ার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখাটা তাঁদের পক্ষে মানসিক দিক থেকে বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে। ছেলেবেলায় ফেলে আসা এই উৎসবের আনন্দের স্মৃতিগুলি তাঁদের নস্টালজিক করে তোলে। ফলে তাঁরা মার্কসবাদী নাস্তিক্যের তকমাটি সাময়িকভাবে ঝেড়ে ফেলে ঈদগাহে গিয়ে নামাজে অংশগ্রহণ করেন। অবশ্য ওই পর্যন্তই, নিত্যদিনের ফরজ নামাজ পড়ার ব্যাপারে তাঁদের কোনও আগ্রহ থাকে না। কিন্তু ঈদের জামাতেও পার্টির নির্দেশ ছাড়া যাওয়া নিয়ে তাঁদের মধ্যে, যাঁরা নেতৃস্থানীয় পরিচিত ব্যক্তিত্ব তাঁদের মনে বেশ অস্বস্তি থাকে। তাই তাঁদের কেউ কেউ পার্টি নেতৃত্ব যাতে টের না পায় সেইভাবে গোপনে নামাজে অংশগ্রহণ করেন। কলকাতায় জনৈক বাঙালি মুসলিম মন্ত্রী যখন পার্কসার্কাস এলাকায় খুব সন্তর্পণে গোপনে পাঁচিল ঘেরা একটি ছোট্ট ঈদগাহে নামাজ পড়তে আসেন, তখন তাঁর এই আচরণ থেকে অনুমান হয় তিনি পার্টিনেতৃত্বের কাছে তাঁর এই আচরণটা গোপন রাখতে চান।

এতো গেল আদর্শগতভাবে ধর্ম যাঁরা মানেন না তাঁদের কথা। কিন্তু যাঁরা মানেন, অন্তত প্রকাশ্যে নিজের ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপারটা প্রদর্শন করার পক্ষপাতী, তাঁদের কারও কারও ভণ্ডামি দেখলে বিস্মিত হতে হয়। কোনও কোনও নেতাকে দেখা গেছে কেবল জনসমাগমে লোকদেখানো নামাজ পড়েন। অন্য সময় ফরজ নামাজ পড়ায় তাঁর কোনও আগ্রহ নেই। রোজার মাসে রোজা আছি বলে পাড়ায় ঘোষণা করেন কিন্তু হিন্দুপাড়ায় গিয়ে খাওয়া দাওয়া করেন। কলকাতার খিদিরপুর এলাকায় বসবাসকারী জনৈক বিখ্যাত নেতা, বছর দশেক আগেও মুসলিম নেতা হিসাবে যাঁর খ্যাতি শুধু কলকাতায় নয়, রাজ্যস্তরে এমনকি জাতীয় স্তরেও ব্যাপ্ত ছিল, যিনি রোজার মাসে তাঁর বসবাসের পাড়ায় নিষ্ঠাবান রোজাদার হিসাবে পরিচিত ছিলেন, অথচ চৌরঙ্গী পাড়ায় জনৈক নাস্তিক হিন্দু পরিচালিত সমাজসেবামূলক সংগঠনের সদর দপ্তরে এসে গোপনে প্রায় প্রতিদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করতেন। এই ঘটনার সাক্ষী আছেন ওই সংগঠনের একাধিক ব্যক্তি। অধুনা অবশ্য এই ভণ্ড নেতা রাজনীতির লাইমলাইটে আর নেই। কিন্তু নিজেকে লাইমলাইটে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেন এমন একজন নেতা, যিনি যে কোনও মুসলিম ইস্যুর চ্যাম্পিয়ন হিসাবে নিজের ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে সদাই তৎপর থাকেন, ধর্মাচরণের নিরিখে তিনিও যে একজন ভণ্ড ছাড়া আর কিছুই নন, এখবর খুব কম লোকই রাখেন। যাঁরা খবর রাখেন তাঁরা জানেন তথাকথিত আইনজীবী এই নেতার ভণ্ডামি বেশি করে নজরে পড়ে রোজার মাসে। সর্বত্র নিজেকে নিষ্ঠাবান রোজাদার হিসাবে জাহির করলেও আদালত চত্বরে তাঁর সহকর্মীরা জানেন তিনি দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়া করেন। কৈফিয়ত হিসাবে বলেন, ডাক্তার নাকি তাঁকে রোজা রাখতে বারণ করেছেন। কিন্তু তাই বলে এফতার পার্টির দাওয়াত গ্রহণে এই আইনজীবী নেতার উৎসাহে কখনও ঘাটতি পড়ে না। কোনও কোনও দিন একদিনে দুটো তিনটে এফতারের দাওয়াত গ্রহণ করেন। এক জায়গায় একটু আগে গিয়ে এফতার বেঁধে নিয়ে পরেরটায় যান। পরেরটাতেও হয়তো তাই-ই করেন। সর্বত্রই বজায় রাখেন ব্যস্ততার ভাব। এইভাবে ধার্মিক অথচ ব্যস্ত রাজনীতিক হিসাবে নিজের ভাবমূর্তি বজায় রাখার চেষ্টা করেন। রাজনীতিতে এরকম ভণ্ড ধার্মিকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়।

একটা পিছিয়ে পড়া সমাজে নেতৃস্থানীয়রা যদি এরকম ভণ্ড হয় তাহলে নৈতিক দিক থেকে সেই সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত হতে বাধ্য। বৈষয়িক দিক থেকে উন্নতি যদি কিছু ঘটেও নীতি আদর্শহীন সেই উন্নতি কখনোই সত্যিকারের সামাজিক অগ্রগতিকে সূচিত করে না। নীতি-আদর্শ সব সময় ধর্মভিত্তিক নাও হতে পারে। কিন্তু সামগ্রিক সামাজিক অগ্রগতির জন্য সংশ্লিষ্ট সমাজের বেশির ভাগ সদস্যের জীবনে নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের একটা আদর্শগত ভিত্তি থাকা জরুরি।

ধর্ম নিঃসন্দেহে সেই আদর্শগত ভিত্তির ভূমিকা পালন করে। সেকুলার মানবতাবাদ কিংবা মার্কসবাদ এসবও সেই ভূমিকা পালন করতে পারত। কিন্তু এইসব আদর্শবাদের উপর গড়ে ওঠা নীতি মূল্যবোধের কাঠামোটা সাধারণ মানুষের বোধগম্য হয়নি। কিংবা এভাবেও বলা যায়, যাঁরা এসব আদর্শবাদের অনুগামী তাঁদের জীবনচর্যা থেকে ব্যাপারটা আদৌ বোধগম্য হয়ে ওঠেনি। তাই আমজনতার জীবনে নীতি মূল্যবোধের কাঠামোটা আজও ধর্মকে আশ্রয় করেই দাঁড়িয়ে আছে। তার ফলে বিভিন্ন ধর্মের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নানা ধরনের ভ্রান্ত ধারণা এবং কুসংস্কারগুলো হয়তো কখনও কখনও কারও কারও ক্ষেত্রে বিপত্তির সৃষ্টি করছে। কিন্তু সেইসব নজির দেখিয়ে সামগ্রিকভাবে ধর্মকে বাদ দিলে নীতি মূল্যবোধের ভিত্তি হিসাবে অন্য কোনও আদর্শবাদ সেই শূন্যস্থান পূরণের জন্য হাজির করা চাই। যাঁরা ধর্মকে এড়িয়ে চলার পক্ষপাতী তাঁরা কি এই শূন্যস্থান পূরণের তাগিদ অনুভব করেন? যদি তা না করেন তাহলে প্রকারান্তরে তাঁদের নৈরাজ্যবাসী ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়! নৈরাজ্যবাদীদের কোনো সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকতে পারে না।

ইসলাম ধর্মে সব চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় সামাজিক দায়বদ্ধতাকে। রাজনীতি ইসলামে সামাজিক দায়বদ্ধতারই অঙ্গ। মুসলিম নামধারী যেসব রাজনীতিক এই ধর্মে অবশ্যপালনীয় কর্তব্যকর্মগুলি এড়িয়ে চলার পক্ষপাতী, অথচ সেটা সাধারণ মানুষের কাছে যথাসম্ভব গোপন রাখতে তৎপর, তাঁরা এই ভণ্ডামির দ্বারা সমাজের যারপরনাই ক্ষতি করছেন। তাঁরা যদি ইসলামে তাঁদের আস্থাহীনতার কথা খোলাখুলি স্বীকার করতেন, তাহলে একটা সামাজিক বিতর্কের জন্ম হত। যে বিতর্ক নীতি-মূল্যবোধের অন্য কোনও বিকল্প আদর্শগত ভিত্তি আছে কিনা সেটার বিচার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একটা সামাজিক আন্দোলনের জন্ম হত। যে আন্দোলন সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মকেন্দ্রিক ভ্রান্তধারণা এবং কুসংস্কারগুলি দূরীকরণে সহায়ক হত। ধর্মহীনেরাও হয়তো ধর্মীয় আদর্শ সম্পর্কে নতুনবোধে উজ্জীবিত হতেন।

সেইরকম কোনও সামাজিক আন্দোলন তৈরির পথে না হেঁটে বিশেষ করে মুসলিম সমাজে প্রগতিপন্থী নেতারা বিশেষ বিশেষ ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে ভণ্ডামিকে প্রশ্রয় দেওয়ায় হয়তো ভোটের বাজারে তাঁরা আশু ফায়দা ওঠাতে পারছেন। কিন্তু আখেরে নিজের এবং সমাজের ক্ষতিই করছেন। কারণ সমাজের চোখে শেষ পর্যন্ত তাঁদের ভণ্ডামি গোপন থাকে না। কিন্তু এইসব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে আমজনতার অনেকেই ভণ্ডামিটাকেই স্বাভাবিক হিসাবে গ্রহণ করতে থাকে। তার ফলে ভাবের ঘরে ফাঁকি দেয়াটা তাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। এই ফাঁকির কারণেই ঐতিহ্যিক সূত্রে পাওয়া নীতি-মূল্যবোধের ধারণাগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিসর্জন দিতে গিয়ে তাদের বিবেকদংশন হয় না। এই বিবেকদংশন না হওয়াটা যখন একটি সমাজের অধিকাংশ মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয় তখন সেই সমাজের চূড়ান্ত অধঃপতনের কথা অস্বীকার করার উপায় থাকে না। বিশেষ করে মুসলিম সমাজের সাম্প্রতিক অধঃপতিত দশার জন্য অন্যান্য আরও কিছু আনুষঙ্গিক কারণকে দায়ী করা গেলেও সবেচেয়ে বেশি দায়ী এই সমাজের রাজনৈতিক নেতাদের নির্লজ্জ ভণ্ডামি। কথাটা অবশ্য অন্যান্য অমুসলিম সমাজের জন্যও প্রযোজ্য। কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের ধর্মীয় ভণ্ডামিজনিত অধঃপতনের তীব্রতা সবচেয়ে বেশি করে অনুভব করা যায় বিশেষ করে বাঙালি মুসলিম সমাজে।